সিএনজিতে গাড়ি চালালে খরচ কমবে ৭৪%

দেশের সাশ্রয় হবে ১৬৫৮ কোটি টাকা

রিপোর্ট : **আসাদুর রহমান**

ঢাকার রাস্তায় বের হলে এখন চোখে পড়ে হলুদ কালো ট্যাক্সিক্যাব। হলুদগুলো শীতাতপায়িত, কালোগুলো নয়। মিটারে কালো ট্যাক্সির ভাড়াও কিছুটা কম। প্রতি কিমি ৬ টাকা। নজরুল এরকমই একটি ট্যাক্সি চালান। ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে তিনি ট্যাক্সিটি নিয়েছেন। ট্যাক্সির বাকি মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করছেন। দিনে ৫৫০ টাকা হারে ৩০ মাস (প্রতি মাসে ২৭ দিন ধরা হয়) কিস্তি চলবে। এতে গাড়ির মূল্য দাঁড়ায় ৫ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ টাকা। ঢাকার বাইরে না গেলে নজরুলের প্রতিদিন গড়ে ১২ লিটার পেট্রোল খরচ হয়। মূল্য ২৭৬ টাকা। গাড়ি চলে ১৫০ কিমি। দৈনিক গড় আয় ৯০০ টাকা। তাছাড়া গাড়িতে উঠলেই যাত্রীকে দিতে হয় ১৫ টাকা করে। ধরে নেয়া হলো প্রতিদিন তার গাড়িতে ১০ বার যাত্রী ওঠে। দৈনিক কিস্তি আর তেল খরচ বাদ দিয়ে দিন শেষে নজরুলের হাতে থাকে প্রায় ২২৪ টাকা। মাস শেষে নজরুলের মোট আয় ৮৫৯২ টাকা।

মিলন সমপরিমাণ ডাউনপেমেন্ট দিয়ে ট্যাক্সি নিয়েছিলেন। একই হারে তখন তার গাড়ির মূল্য ধরা হয়েছিল ৫ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ টাকা। গাড়ি নিয়েই মিলন তার ইঞ্জিনকে সিএনজিতে কনভার্ট করিয়ে নেন। এতে তার খরচ পড়ে ২৬ হাজার টাকা। অর্থাৎ গাড়ির মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লাখ ৯১ হাজার ৫০০ টাকা। কিন্তু সিএনজিতে রূপান্তরের পর তার খরচ ৭৪% কমে যায়। ২৩ টাকার পেট্রোলে কোনো ট্যাক্সি যতটুকু চলে, ততটুকু পথ গ্যাস দিয়ে চালাতে খরচ দাঁড়ায় ৬.০৩ টাকা। মিলনের ১৫০ কিমি পথ চলতে খরচ হয় ৯.৭২ কিউবিক মিটার বা ৭২.৪১৪ টাকার গ্যাস। তার প্রতিদিন সাশ্রয় ২০৩.৫৮৬ টাকা। দিন শেষে মিলনের হাতে থাকে ৪২৭.৫৯ টাকা। সব খরচ বাদে তার প্রতি মাসে আয় ১৫৩১০.৪৬ টাকা। অর্থাৎ নজরুলের চেয়ে ৬৭১৮.৪৬ টাকা বেশি। প্রথম ৪ মাসের মধ্যেই মিলন গাড়ির সিএনজি রূপান্তরের খরচ তুলে নিতে পারে।

সিএনজিতে রূপান্তর করার জন্য মিলনের যেমন ব্যক্তিগত লাভ হয়েছে তেমনি লাভবান হচ্ছে দেশ। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সূত্র অনুযায়ী গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ২৯৯৯.২০ কোটি টাকার পরিশোধিত, ১৫৯৮.৬০ কোটি টাকার অপরিশোধিত এবং ৬৯.৩৪ কোটি টাকার লুব অয়েল আমদানি করেছে। এর ৪৮ শতাংশ অর্থাৎ ২২৪০.২২৭ কোটি টাকার তেল যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দেশের যানবাহনগুলোকে সিএনজিতে রূপান্তর করা গেলে দেশ প্রতিবছর এই পরিমাণ টাকার তেল আমদানি খরচ বাঁচাতে পারে। সিএনজি পেট্রোলের তুলনায় সাশ্রয়ী হওয়ায় প্রতিবছর ৫৮২.৪৫৯ কোটি টাকা ব্যয় করেই সিএনজি'র মাধ্যমে চাহিদা মেটানো যাবে। সিএনজি'র বর্তমান বাজার দর প্রতি কিউবিক মিটার ৭.৪৫ টাকা। প্রয়োজন পড়বে ৭৮.১৮ কোটি কিউবিক মিটার গ্যাসের। ফলে প্রতিবছর দেশ যানবাহনের জ্বালানি হতে নিট মুনাফা করতে পারবে প্রায় ১ হাজার ৬৫৮ কোটি টাকা।

সিএনজি চালিত গাড়ি

পেট্রোল চালিত গাড়ি

‘কেউ যদি আগামীতে সিএনজিতে কনভার্ট করা গাড়ি আমদানি করতে চায় তবে তাকে শুল্ক রেয়াত দেয়া হবে’

এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেন
প্রতিমন্ত্রী
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করতে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি কতটুকু কাজ করেছে?

এ. কে.এম. মোশাররফ হোসেন : ৮৬ সালে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও এর কোনো কাজ এতদিন হয়নি। এ পর্যন্ত তারা মাত্র ১৫শ’ গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর করেছে এবং মাত্র ৪টি ফিলিং স্টেশন স্থাপন করেছে। ফিলিং স্টেশন পর্যাপ্ত না থাকায় লোকজন গাড়ি সিএনজিতে কনভার্ট করার আগ্রহ পাচ্ছে না।

২০০০ : এর সুবিধা সম্পর্কে বলুন।

মোঃ হোঃ : একটি উদাহরণ দেই। সিএনজি করা দু’ স্ট্রোকের একটি স্কুটার সারাদিন চালালে ড্রাইভারের দিন শেষে অতিরিক্ত লাভ থাকে ১৫০ টাকা। তাহলে সে প্রতিমাসে অতিরিক্ত লাভ পাচ্ছে ৪৫০০ টাকা। একটি স্কুটারে সিএনজিতে রূপান্তরের খরচ প্রায় ২০ হাজার টাকা। সে কয়েক মাসের মধ্যেই এই টাকা তুলে নিতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন দেশ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারবে তেমনি ব্যবহারকারী যারা তাদের অর্থনৈতিক সাশ্রয় হবে। তাছাড়া পরিবেশ থাকবে দূষণমুক্ত।

২০০০ : সিএনজি বিষয়ে সরকারি কি কি পরিকল্পনা রয়েছে?

মোঃ হোঃ : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ২ বছরের মধ্যে সমস্ত গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর করা হবে। আমরা এর দায়িত্ব সম্পূর্ণ প্রাইভেট সেক্টরে দিয়ে দেবো। প্রাইভেটভাবে আপনি ওয়ার্কশপ করবেন, ফিলিং স্টেশন করবেন, ইকুইপমেন্ট আমদানি করবেন। এ আমদানি হবে শুল্কমুক্ত। এতে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো ব্যবসা করতে একটি বড় সুযোগ পাবে। অন্যদিকে আমাদের পেট্রোল পাম্পগুলোকে গ্যাস স্টেশনে রূপান্তর করতে হবে। আমাদের প্রজেক্ট থেকে আমরা পেট্রোল পাম্পগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেবো।

২০০০ : দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনচালিত যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তরে আপনারা কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

মোঃ হোঃ : যত বেবিট্যাক্সি আছে তাদের সঙ্গে লিজিং কোম্পানি ব্যাংকের সাথে Agreement করা হবে। ব্যাংক থেকে তারা ঋণ পাবে। যে প্রাইভেট কোম্পানি থেকে স্কুটারটি CNGতে রূপান্তর করা হবে ঐ কোম্পানিকে নির্দিষ্ট ব্যাংকটি টাকা দেবে। কিন্তু এর জন্য স্কুটার মালিককে ব্যাংকে ডাউনপেমেন্ট দিতে হবে। ব্যাংক এখন পর্যন্ত ৫ হাজার টাকা ডিমান্ড করেছে। আমি যোগাযোগ করছি ডাউন পেমেন্টের টাকা কমানোর জন্য। ব্যাংককে আমরা সরকার থেকে একটি গ্যারান্টি দেবো। এই গ্যারান্টির কারণে স্কুটার মালিকরা ব্যাংকে কিস্তির মাধ্যমে টাকা পরিশোধের সুযোগ পাবে। ১৩০০-১৫০০ টাকা তাদের মাসিক কিস্তি দিতে হবে। প্রয়োজনে তারা আরো বেশি করে শোধ করতে পারবে। কয়েকটি ব্যাংকের সঙ্গে কথা চলছে। লিজিং ফাইন্যান্সিং কোম্পানি রাজি হয়েছে।

২০০০ : সিএনজি কীট আমদানিতে সরকারের কোনো অনুমতির প্রয়োজন পড়বে কি?

মোঃ হোঃ : সরকারের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তা মনে করি না। আমরা শুধু পণ্যের মান দেখবো তা সঠিক কিনা। কেউ যদি আগামীতে সিএনজিতে কনভার্ট করা গাড়ি আমদানি করতে চায় তবে তাকে শুল্ক রেয়াত দেয়া হবে। আর একটি বিষয় আমরা করবো। নতুন পেট্রোল পাম্প যত স্থাপন করা হবে তাতে অবশ্যই সিএনজি’র ব্যবস্থা

সিএনজি কী

সিএনজি মিথেন গ্যাসের একটি ভিন্ন রূপ। বাসা-বাড়ির চুলায় ব্যবহৃত গ্যাসের সঙ্গে এর পার্থক্য সামান্য। সাধারণ গ্যাস পাইপ লাইনে ১০ PSI চাপে থাকে। সিএনজি স্টেশনে স্থাপিত বিশাল আকৃতির Compressor মেশিনের সাহায্যে এই ১০ PSI চাপের গ্যাস টেনে সংকুচিত করা হয়। ১০ PSI চাপের গ্যাসকে প্রথমে ১২০০, দ্বিতীয় ধাপে ১৮০০ এবং সবশেষে ৩০০০ PSI চাপে সংকুচিত করে সিলিন্ডারে জমা করা হয়। পরবর্তীতে সেটা গাড়ির সিলিন্ডারে দেয়া হয়।

বায়ুদূষণমুক্ত সিএনজি

বর্তমানে ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ দূষণের অন্যতম বায়ু দূষণ। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবদান রাখে যানবাহন নির্গত কালো ধোঁয়া। ঢাকার বাতাসের মূল শত্রু হলো দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিন, বেবিট্যাক্সি ও টেম্পু। রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ রায়হানুল আবেদীনের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, প্রতি বছর ঢাকার বাতাসে ২ লাখ ৯৬ হাজার ৬৬২টি যানবাহন ১ লাখ ৯ হাজার ৫৯০ টন কার্বন মনো অক্সাইড, ২২ হাজার ৭৪৫ টন নাইট্রোজেন অক্সাইড, ৩৭৮ টন

রাখতে হবে। এতে পেট্রোল পাম্পগুলো সরকারি সহায়তা পাবে।

২০০০ : ডিজেল গাড়ির বিষয়ে আপনাদের ভাবনা কি?

মোঃ হোঃ : ডিজেল গাড়ির জন্য এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। পেট্রোল পরিবেশের বেশি ক্ষতি করে। তাছাড়া ডিজেলগাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর করা ব্যয়বহুল।

২০০০ : জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আপনাদের কর্মসূচি কি কি?

মোঃ হোঃ : এজন্য আমরা পত্রিকা, রেডিও, টিভিতে প্রচারণা চালাবো। তাছাড়া পেট্রোলিয়াম আইনের যেসব Regulatory Control রয়েছে তার পরিবর্তন আনতে হবে।

২০০০ : দেশের সব যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করলে প্রচুর গ্যাসের প্রয়োজন পড়বে। তবে কেন সরকার গ্যাস রপ্তানির কথা বলছে?

মোঃ হোঃ : বর্তমানে আমরা স্টাডি করে দেখেছি– দেশে কতটুকু গ্যাস আছে আর কতটুকু দেশের লাগতে পারে। আমাদের চিন্তা করতে হবে কোনটা দেশের জন্য অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক। আর একটি বিষয়, দেশের যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাতে গ্যাস রপ্তানি প্রয়োজনীয় কিনা। অনেকে বলছে আমরা গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি এটা ভুল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্যাসের বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেবো।

২০০০ : রপ্তানির বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন কেন?

মোঃ হোঃ : বিগত সরকার ৬টি চুক্তি করে গেছে। ৬টি প্রডাক্ট শেয়ারিং কনট্রাক্ট করে গেছে বিদেশে রপ্তানির জন্য। সেই Contruct-এ সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে LNG করে রপ্তানি করা হবে। উদ্দেশ্য কিন্তু রপ্তানি। শুধু প্রসেস করেছে LNG করে। সারা দেশের সব ব্লক একবারে বিদেশী কোম্পানির কাছে দিয়ে দিয়েছে। আমি যদি সব গ্যাস একবারে উঠিয়ে ফেলি তাহলে এত গ্যাস ব্যবহার করবো কিভাবে। একবার চুক্তি করে গ্যাস পেলেন। আমি কি তা বন্ধ করে রাখবো? চুক্তি অনুযায়ী আমি তা করতে পারি না। সুতরাং গ্যাস রপ্তানি করতে হবে। মাধ্যমটা হলো LNG। LNG রপ্তানি যদি লাভজনক হয় তবে রপ্তানির অনুমতি দিতে হবে। অন্যদিকে চুক্তিতে এও রয়েছে, গ্যাস রপ্তানির সব ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকবে। এ বিষয়ে ওরা আমাদের চাপ দিতে পারবে না। খুব সুচারুভাবে গ্যাস রপ্তানির পরিকল্পনা নিয়ে গত সরকার চুক্তিগুলো করে গিয়েছে। আমরা এখন অনেকটা আটকে গেছি।

২০০০ : LNG করলে দেশে কিছু কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে– এ দিকটা ভেবে দেখেছেন কি?

মোঃ হোঃ : চুক্তি অনুযায়ী ওদের কাছ থেকে গ্যাস আমাকে কিনতে হবে। কিন্তু কিনতে হবে প্রতি ঘনফুট ২.৮ ডলারে। এই দামে গ্যাস কিনে আমি যাই করি না কেন তাতে সবকিছুর দাম ডবল হয়ে যাবে। তা না হলে হাজার হাজার কোটি টাকা আমাদের লোকসান গুনতে হবে। আমি কোন দিকে যাবো। যারা গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধে বলছে, তারা চুক্তিটা পরীক্ষা করে দেখুক। তারা বলুক কি করা যায়। দেশের সম্পদ প্রয়োজনে বাইরে যাবে, সম্পদ দেশে বসিয়ে রাখলে কি কোনো লাভ আছে!

২০০০ : তাহলে দেশের প্রয়োজন মেটাবেন কিভাবে?

মোঃ হোঃ : গ্যাসে একটি বিষয় আছে। তা হলো যেসব দেশে ব্যাপকভাবে গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে সেখানেই দেখা গেছে যতটুকু আশা করা হয়েছিল তার থেকে ডবল গ্যাস পাওয়া গেছে। কোথাও বা ট্রিপল হয়ে গেছে। যেমন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া। গ্যাস রয়েছে এমন প্রায় প্রতিটি দেশে একই ঘটনা ঘটেছে। আমরাও আশা করতে পারি যতটুকু ধারণা করা হচ্ছে তার থেকে বেশি গ্যাস পাবো। তখন দেশের চাহিদা মেটাতে কোনো সমস্যা হবে না।

'অনেকে বলছে আমরা গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি এটা ভুল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্যাসের বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেবো'

সালফার ডাই অক্সাইড, ৭২৫ টন হাইড্রো কার্বন এবং ১০২৯ টন SPM ছড়ায়। ঢাকায় চালিত ৬৬ হাজার ৩৬০টি বেবিট্যাক্সি প্রতিবছর ২৪,৫২৪ টন কার্বন মনো অক্সাইড, ৭৪৭ টন নাইট্রোজেন অক্সাইড, ৯১ টন সালফার ডাই অক্সাইড, ১৯,৬১৯ টন হাইড্রো কার্বন এবং ২,১১৯ টন SPM ছড়ায়। পেট্রোলচালিত যানবাহনসমূহের জ্বালানিতে টেট্রাথাইলয়েড হিসেবে সিসা মিশ্রিত থাকে। এই সিসা মিশ্রিত জ্বালানি পোড়ার ফলে লেড ব্রোমাইড, লেড ক্লোরাইড ও ধাতব সিসার কণা ধোঁয়ার সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ওজনে ভারী বলে এই সিসার কণাগুলো ভূমি থেকে খুব একটা ওপরে উঠতে পারে না। ভূমি থেকে মাত্র দু' ফুট উঁচুতে বাতাসে এই সিসার কণাগুলো ভাসতে থাকে। ফলে এই সিসার প্রধান শিকার শিশু। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাদের ফুসফুসে এই সিসা ঢুকতে থাকে। আক্রান্ত শিশুদের মানসিক অসুস্থতা, স্মরণশক্তি হ্রাস প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। শুধু শিশুরাই নয়, সিসা গ্রহণের ফলে বয়স্করা স্নায়ুতন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা, অত্যধিক মানসিক চাপ, বিভিন্ন প্রকার বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস আবহাওয়া উপযোগী। এদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে ৯৬.৯০ ভাগ মিথেন, ১.৮০ ভাগ ইথেন, ০.৫০ ভাগ প্রপেন, ০.২০ ভাগ বুটেন, ০.৩০ ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ০.৩০ ভাগ নাইট্রোজেন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে সালফার নেই। সিএনজিতে সিসাও থাকে না। CNG-এর অক্টন নম্বর (Octan number) প্রায় ১৩০ যেখানে সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন পেট্রোলের অকটেন নম্বর প্রায় ৯৬। আর তাই CNG পেট্রোলের চেয়ে অনেক সহনীয় জ্বালানি। এতে বায়ু দূষণের হার একেবারে নেই বললেই চলে।

রাজধানীতেই সাশ্রয় ৫০ কোটি টাকা

আগেই বলা হয়েছে, আর্থিক দিক দিয়ে সিএনজি দেশকে প্রতি বছর ২২৪০.২২৭ কোটি টাকার জ্বালানি তেল আমদানি হতে রক্ষা করতে পারে। আর শুধু ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা হতে সাশ্রয় থেকে পারে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। হিসাবটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। বাংলাদেশের তেল আমদানিকারক তিনটি কোম্পানি পদ্মা, মেঘনা, যমুনা-এর ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৭৫টি পেট্রোল পাম্প রয়েছে। পশ্চিম দিকে মিরপুর ব্রিজ, উত্তরে টঙ্গী ব্রিজ, দক্ষিণে যাত্রাবাড়ী রেল ক্রসিং এবং বুড়িগঙ্গা মৈত্রী সেতু– এই এলাকাটিকে তেল কোম্পানিগুলো ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা হিসেবে ধরে নিয়েছে। গত অর্থবছরে এই তিনটি কোম্পানি ২ কোটি ৩৩ লাখ ১৬ হাজার লিটার অকটেন, পেট্রোল ও ডিজেল ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় সরবরাহ করে যার বর্তমান বাজার দর ৪৮ কোটি ৫ লাখ

১৯ হাজার ৫০০ টাকা। ঢাকার গাড়িগুলো সিএনজিতে রূপান্তর করা হলে সিএনজি খরচ হবে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা। সাশ্রয় থাকবে ৩৫ কোটি ৫৫ লাখ ৮৪ হাজার ৪৩০ টাকা। সিএনজি'র প্রয়োজন পড়বে ১ কোটি ৬৭ লাখ ৬৯ হাজার ৮০৮ কিউবিক মিটার। একটি সিএনজি স্টেশন তৈরিতে খরচ হয় ২ কোটি টাকা। ফলে ঢাকার ৭৫টি পেট্রোল পাম্পকে সিএনজি রূপান্তরে খরচ পড়বে ১৫০ কোটি টাকা। কিন্তু সাশ্রয়ী টাকা দিয়ে সাড়ে ৪ বছরে সিএনজি স্টেশন স্থাপনের খরচ উঠিয়ে আনা সম্ভব। আর্থিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে বর্তমান সরকার তার শাসনামলের শুরুতেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন আগামী দু'বছরেরর মধ্যে ঢাকার অর্ধ লক্ষাধিক পেট্রোল ও অকটেনচালিত গাড়িকে সিএনজিতে রূপান্তর করতে হবে। তিনি বৈঠকে ঘোষণা দিয়েছেন, ২ বছর পর ঢাকার রাস্তায় একটিও পেট্রোলচালিত বেবিট্যাক্সি চলতে পারবে না। সেই সঙ্গে একই সময়ের মধ্যে সব সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত পেট্রোল ও অকটেনচালিত যানবাহনকে সিএনজি'র আওতায় আনতে হবে। সরকারি আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় যেন বিষয়টি কোনো প্রকার বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে সরকার সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন, রূপান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি আমদানি এবং রূপান্তর কারখানা স্থাপন বিষয়গুলোকে পুরোপুরি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া

হয় গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে। এ বছর এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিএনজি সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর থেকে তুলে নেয়া হয় সকল প্রকার শুল্ক। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা দিয়েছে, সিএনজিতে রূপান্তর করা গাড়ি আমদানি করলে সেখানেও দেয়া হবে শুল্ক রেয়াতের সুবিধা। সিএনজি স্টেশন স্থাপনে সরকারের এই বেসরকারিকরণ নীতির ফলে সাড়া পড়েছেও ব্যাপক। এ পর্যন্ত দেশের ১২টি বেসরকারি কোম্পানি বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন শহর ও মহাসড়কের ওপর ২৬৫টি গ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনের কাজ হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি কোম্পানিগুলো প্রায় দেড় লাখ গাড়িকে সিএনজিতে রূপান্তরেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সিএনজি'র ব্যবহার কম কেন?

গাড়িকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হলে ইঞ্জিনের ক্ষতি হতে পারে, গাড়িকে ওভার হোলিং করাতে হয় গাড়ির মালিকদের। এ ধরনের ধারণার কারণে দেশে সিএনজি'র ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে না বলে অনেকে মনে করেন। ওরিয়ন ট্যাক্সিক্যাবের চালক মুজিবুর রহমান গত দেড় বছর ধরে সিএনজিতে রূপান্তরিত গাড়ি চালাচ্ছেন। সিএনজিতে চালিত গাড়ির সমস্যা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি ২০০০কে বলেন, 'এতে ফিল্টার বদলাতে হয় বেশি। তাছাড়া টিউন আপের ও সমস্যা দেখা দেয় প্রায়ই।' তবে তিনি ঢাকা শহরে সিএনজি স্টেশনের অভাবকেই সিএনজি ব্যবহার কম হওয়ার কারণ বলে মনে করেন। সিএনজি ব্যবহার ইঞ্জিনের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর– প্রশ্ন করা হলে র‍্যাংগস ওয়ার্কশপ লিমিটেডের ম্যানেজার ইকবাল হাসান জানান, এতে গাড়ির ইঞ্জিনের সামান্যতম ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন, বর্তমানে ২/৩ ধরনের সিএনজি কীট এদেশে আমদানি করা হয়। সব মডেলের গাড়িতেই এই কীট লাগানো হয়। তাছাড়া এদেশে যেভাবে কীট লাগানো হয় সেটাও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। সিএনজিতে রূপান্তর করতে পরিপূর্ণ দক্ষ লোক এদেশে একজনও নেই। ফলে গাড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিকআপ নেয় না, গাড়ি নক করে বা কাঁপে। ২/৩ মাস পর থেকেই রূপান্তরিত গাড়িগুলোতে এই সমস্যা দেখা দেয়। ইকবাল হাসান জানান, পৃথিবীর কোথাও প্রাইভেট কার সিএনজিতে চলে না। কারণ এর সিলিন্ডার ভারী। তাছাড়া গাড়ির লাগেজ রাখার জায়গা নষ্ট করে এই সিলিন্ডার। ডিজেলচালিত ও দুই স্টোকের ইঞ্জিনচালিত গাড়ি পরিবেশের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস, ট্রাক সিএনজিতে রূপান্তরে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। দিল্লিতে আইন পাসের মাধ্যমে বাস, ট্রাকগুলোকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে শুরু হয়েছে প্রাইভেট কার নিয়ে মাতামাতি। কোনো প্রকার পলিসি গ্রহণ না করে এই উদ্যোগ নেয়ার ফলে তা মানুষের আগ্রহ কাড়তে পারছে না।

আরপিজিসিএল : দুর্নীতির আখড়া

বর্তমানে ঢাকার রাস্তায় মাত্র দেড় হাজার সিএনজি চালিত গাড়ি চললেও যানবাহনে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিকল্পনা নেয়া হয় ১৯৮২ সালে। তখন এ বিষয়ে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘ ৪ বছর পরে তার কাজ শুরু হয়। '৮৫-'৮৬ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংকের ২২ কোটি ৫১ লাখ টাকা অর্থায়নে এই প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। দেশের অবকাঠামো অনুযায়ী গাড়িগুলোকে সিএনজিতে রূপান্তর করা সম্ভব কিনা, তাতে গাড়ি চলা সম্ভব কিনা এবং এ দুটো বিষয় যদি সফল হয় তবে প্রাথমিকভাবে আড়াই হাজার গাড়িকে সিএনজিতে রূপান্তর করাই ছিল প্রকল্পের কাজ। এই তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বব্যাংক তখন এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা দেয়। ১৯৮৭ সালে প্রকল্পটিকে কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। প্রথম দুটি উদ্দেশ্য সফল হলেও তৃতীয় কাজটিতে শুরু হয় ঢিলেমি। রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা এ বিষয়ে নিজেরা কোনো প্রকার দোষ নিতে অস্বীকার করেন। তাদের মতে গ্যাস স্টেশনের অভাবে তখন গাড়ির মালিকরা তাদের গাড়িকে সিএনজিতে রূপান্তরের প্রতি আগ্রহী হয়নি। '৯১ থেকে '৯৬। বিএনপি'র সরকারের এ সময়ে বিষয়টি ছিল একেবারেই উপেক্ষিত। জ্বালানি তেল আমদানিকারক এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনের আর্থিক লাভ থেকে বঞ্চিত হবার সুযোগ থাকায় তৎকালীন সরকার বিষয়টির ওপর একেবারেই নজর দেয়নি। পরবর্তীতে প্রকৌশলী এবিএম ফজলে এলাহী ব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তিনি সিসাবিহীন পেট্রোল আমদানির উদ্যোগ নেন। তাছাড়া সে আমলে ৫০ হাজার বেবিট্যাক্সিকে সিএনজিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অন্যদিকে তদবির আর স্বজনপ্রীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে

সরকারের রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি দেশের বিভিন্ন এলাকায় পেট্রোবাংলার অফিসগুলোতে কর্মরত-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে চলছে এই কোম্পানির কাজ। সূত্র হতে জানা যায়, এখানে কর্মরত অধিকাংশ কর্মকর্তা কর্মচারী ঢাকায় পোস্টিং পাবার জন্য তদবিরের মাধ্যমে এখানে এসেছেন। এদের প্রত্যেকের লবিং খুবই শক্ত। খোদ এমডি চাইলেও কাউকে এখান থেকে সরাতে পারেন না। দুর্নীতিবাজ কোনো কর্মকর্তাকে এ অফিস থেকে সরাতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোবাংলা, মন্ত্রণালয় থেকে তদবিরের ফোন আসা শুরু হয়। এমনকি কর্মকর্তাদের বদলি থামাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ব্যক্তিগত তদবিরের নজির এখানে রয়েছে। স্বজনপ্রীতি ভয়াবহ দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যায়, প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ইনচার্জ) প্রকৌশলী এমএ মান্নানের কথা। চাকরিরত অবস্থায় বেশ কয়েকবার সাসপেন্ড হওয়া এমএ মান্নান গত সরকারের আমলে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পান। এখানে জায়গা করে নেয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় হয়ে যে বিষয়টি তার কাজ করেছে সেটি হলো তিনি ছিলেন এক বিশেষ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। তার আমলে সিএনজি কার্যক্রম বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফিলিং স্টেশনগুলো '৯৭-'৯৮ অর্থবছরে কিছুদিন পর পর গ্যাসের প্রেশারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এ পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীতে মাত্র ৬টি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন রয়েছে– যার ৪টি রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি এবং ২টি বেসরকারি খাতে করা হয়েছে।

প্রয়োজন ব্যাপক অবকাঠামোগত পরিবর্তন

ইঞ্জিনচালিত গাড়িগুলোকে সিএনজিতে রূপান্তর সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। পেট্রোলিয়াম ডিলার এসোসিয়েশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ জানন, এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার আগে এ ক্ষেত্রে ব্যাপক অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। ঢাকার সব পেট্রোল ও অকটেনচালিত গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর করলে প্রতি বছর ঢাকা মহানগরীতে অতিরিক্ত ১ কোটি কিউবিক মিটার গ্যাসের প্রয়োজন পড়বে। এ গ্যাস সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ভোর ৮টা হতে ১০টা এবং সন্ধ্যার ঘন্টা দুয়েক ঢাকার বাসা বাড়িগুলোতে রান্না চলে। এ সময় ঢাকায় সরবরাহকৃত তিতাস গ্যাসের প্রেশার কম থাকে। অন্যদিকে সন্ধার পর ইলেকট্রিসিটির চাপ বেশি থাকায় কমপ্রেশার মেশিন দ্রুত কাজ করতে পারে না। ফলে গাড়িতে গ্যাস দিতেও দেরি হয়ে যায়। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত গাড়িগুলো সিএনজিতে রূপান্তর করার বিষয়ে তিনি বলেন, এইসব প্রতিষ্ঠানের গাড়িগুলোর সব সময় বাকিতে তেল নিয়ে যায়। ২ লিটারের জায়গায় ২০ লিটার তেল তুলে। মাস শেষে তার পুরোটা শোধ কেউই করে না। পেট্রোল পাম্পগুলোর প্রতিটিরই সরকারের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থের পাওনা রয়েছে। কিন্তু সিএনজিতে বাকিতে গ্যাস দেয়া সম্ভব হবে না। এসব সমস্যা সমাধানে তিনি বলেন, ঢাকায় গ্যাস সরবরাহ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহও বাড়াতে হবে। রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোতে গ্যাসচালিত কমপ্রেশার মেশিন বসাতে হবে। সর্বোপরি সরকারের থাকতে হবে সর্বাত্মক আন্তরিকতা। জনসাধারণের কাছে বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। বিভিন্ন প্রচার, প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারণকে এ বিষয়ে আরও সজাগ করে তুলতে হবে।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

সিএনজি করতে যা প্রয়োজন

একটি পেট্রোল বা অকটেনচালিত যানকে সিএনজিতে রূপান্তর করতে হলে ১৩টি যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়। এগুলো হলো ১. সিলিন্ডার, ২. রেগুলেটর, ৩. ইউমিলেটর/ পেট্রোল সলিনয়েড বাল্ব, ৪. এডভান্সড প্রসেসর, ৫. মিকচার, ৬. পাওয়ার এডজাস্টিং স্ক্রু, ৭. ফিলিং বাল্ব, ৮. সিলিন্ডার স্টোভ বাল্ব, ৯. আইডিয়াল পাইপ, ১০. হাইপ্রেশার পাইপ, ১১. কানেকটর, ১২. সিএনজি/ পেট্রোল সিলেক্টর সুইচ, ১৩. প্রেশার গ্যাস।

পেট্রোল বা অকটেনচালিত গাড়ি ২ ধরনের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে Electric fule Injection (EFI) অন্যটি হলো কার্বুরেটর। EFI প্রকৃতির গাড়িতে ইউমিলেটর প্রয়োজন হবে অন্যদিকে কার্বুরেটর প্রকৃতির গাড়িতে প্রয়োজন হবে পেট্রোল সলিনয়েড বাল্ব। সিলিন্ডারে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩০০০ পাউন্ডে (৩০০০ PSI) চাপে সংকুচিত অবস্থায় থাকে। ৩ স্তরের রেগুলেটরটি সিলিন্ডারের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে এটমসফেরিক প্রেশারে নিয়ে এসে মিকচারের মাধ্যমে ইনজেনারেল ইনল্যান্ড মেনিপুল দিয়ে ইঞ্জিনে দেয়া হয়। ফিলিং বাল্ব সিলিন্ডারে গ্যাস ভরার কাজে ব্যবহৃত হয়। গাড়িকে সিএনজিতে রূপান্তর করলে তা জ্বালানি তেল দিয়ে চালানোরও সুবিধা থাকে। সিএনজি/পেট্রোল সিলেক্টর সুইচ-এর মাধ্যমে গাড়িকে প্রয়োজনে তেল বা গ্যাসে চালানো যায়। ২২,৬০০ টাকা হতে ২৮,৬০০ টাকার মধ্যে যে কোনো ধরনের কার, জিপ, পিকআপ, মাইক্রোবাসকে সিএনজিতে রূপান্তর করা সম্ভব। বেবিট্যাক্সি বা স্কুটারকে সিএনজিতে রূপান্তর খরচ আরও কম। মাত্র ২০ হাজার টাকা।